আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আমি বরাবরের সেই ল্যাবেণ্ডিস মার্কা রাজুই থেকে গেলাম। নীচে পার্টির সব অভ্যাগতই এসে গেল, আমার এখনও টাই বাছা হল না। সাদার ওপর নীল পিনস্ট্রাইপ শার্টের ওপর নীল ব্লেজারটা চাপালেই মেরুনের ওপর স্কাই ব্লু পোলকা ডটের ওই টাইটা উঠে আসবেই গলে। এভাবেই চলে আসছে গত সাত দিন; ভেবেছিলাম আজ নতুন একটা টাই বেছে ফেলবই।

আর এখন আমি আধ ডজন টাই নিয়ে গলায় ঘোরাচ্ছি। আর এইমাত্র

-রাজুকাকু! প্লিজ গেট রেডি। সব্বাই এসে গেছে। উই আর অল ওয়েটিং ফর ইউ। দরজায় টোকা মেরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে আমায় সোমা। ভাবছে অত না চেঁচালে আমার ঘুম ভাঙবে না। মেয়েটার ধারণা আমি দোর দিলেই কম্বলের নীচে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ি। ওর ভাষায়-কাকুর লণ্ডন ঘুম!

আর আমি আধ ডজন টাই হাতে আলমারির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কোনোদিন মানুষ হব না।

এক মাসও হয়নি আমার নির্মলদার বাড়িতে, কিন্তু কারো আর জানতে বাকি নেই আমি কী অসম্ভব স্নান, নিদ্রা আর আত্মবিলাসী। যদি বাথটাবে সাবান জমিয়ে স্নানে নামলাম তো ঘড়ি স্থির হয়ে গেল। যদি ঘুম লাগালাম তো

নাওয়া-খাওয়া চুলোয় গেল। আর যদি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে জানালার পাশে বসলাম তো আমার থেকে 'আমি'টাই উধাও হল। আমি একটা রক্ত-মাংসের স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। তখন ক-বার সোমা নীচের থেকে হাঁক দিল, নির্মলদা দোতলার টয়লেট ব্যবহার করতে এসে মৃদুকণ্ঠে ক-বার ডাকলেন 'রাজু! রাজু!' আমার খেয়াল থাকে না। কিন্তু এই বিশ্বকুঁড়েমির সঙ্গে এক বিশ্বকপালও আমার জুটেছে। সবাই আড়াই দিনের মাথায় আমার ভাবগতিক বুঝে নিয়ে তৃতীয় দিন থেকে আমার সাতখুন মাফ করতে থাকে। সোমা আর ওর বাবাও আমাকে প্রশ্রয়ের সুরে ইদানীং ডাকে ফিলোসফার বলে। ওদের ধারণা আমি সম্ভবত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ভাবি।

সত্যিই যদি ওরা দেখতে পেত আমার ভিতরটা। আমি যখন স্নানে কিংবা নিজের মধ্যেই ডুবে থাকি তখন আসলে আমি কিছুই ভাবি না। শুধু একটা স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব ছেয়ে থাকে আমার চোখে, যা আমি আনমনে দেখি। আবার দেখিও না। কিন্তু ভীষণ সুখ অনুভব করি। বাবার কথা মনে পড়ে, যিনি থেকে থেকেই বলতেন, রাজুকে আমি অক্সফোর্ডে পড়াব। কিন্তু হঠাৎ একদিন মামলার ফাইল দেখতে দেখতে সেরেব্রাল স্ট্রোক হল বাবার। ফলে কথা রাখা হয়নি। লণ্ডনে এসে অজস্র সুখের মধ্যে একটা সুখ হল মনশ্চক্ষে বাবার সেই মুখটা দেখতে পাওয়া। একেক দিন গলায় টাই বাঁধতে বাঁধতে আমি আপন মনে হেসে ফেলি। কারণ আয়নায় তখন আমি আমার মুখের জায়গায় দেখতে পাই বাবার মুখ। কোর্টে যাওয়ার আগে তড়িঘড়ি টাইয়ের নট ফাঁসাতে গিয়ে লেংথ মিস করছেন!

সোমার ডাক শুনে আমার চকিতে মনে পড়ল অফিসের বন্ধু রাণাকে। ও-ই চিঠি লিখে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছিল লণ্ডনে। বলেছিল, থাকবি তো চার মাস। অযথা পাউণ্ড নষ্ট করবি কেন? দাদাকে লিখে দিচ্ছি—তোর বোর্ড

অ্যাণ্ড লজিং ফ্রি। পকেটে যা থাকে নিজের কাজে খরচ কর। দাদাকে একটা পেনিও দেবার দরকার নেই।

একই সঙ্গে আশ্বস্ত এবং বিব্রত হয়ে বলেছিলাম, সে কী বলছ! অতদিন থাকব, একটা পয়সাও দেব না সংসারে?

রাণা বলল, এগজ্যাক্টলি! দাদার ওখানে ওটাই নিয়ম। আর দাদার সংসার বলতে তো দাদা আর সোমা। বউদি শিলঙে থাকেন, কলেজ অধ্যাপিকা। ছুটিছাটায় লণ্ডন যান। দেখবি সোমাই তোর দেখাশোনা করবে। শি ইজ এ জেম অব এ গার্ল! সোমাই ডেকে উঠল ফের, কাকু! আর আমি এই প্রথম ওর ডাকে উত্তর করলাম, যাচ্ছি! আই'ম রেডি! রীতিমতো বিব্রত হয়ে আমি ওই মেরুন জমিতে নীল পোলকা ডটের টাইটা চড়িয়ে লম্বা লম্বা স্টেপিং-এ নেমে এলাম একতলার বসার ঘরে।

কোনো অর্থেই কোনোদিন আমি পার্টি ম্যান নই। পার্টিতে লাগসই কথোপকথন আমার আসে না, ঘুরে ঘুরে বারোজনের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি না, কাকে, কোন পার্টিতে আগে দেখেছিলাম মনে করতে পারি না। আরও বড়ো সমস্যা, হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে একই সঙ্গে খাওয়া আর বাতচিৎ চালিয়ে যেতে পারি না। প্রায়ই দেখি আমি যখন খাবার তুলেছি হাতে তখন একে একে লোকজন আলাপে প্রবৃত্ত হচ্ছেন আমার সঙ্গে। শেষে আধপেটা খেয়ে নিজেকে দুষতে দুষতে বাড়ি ফিরি। কিন্তু আজ আমি পেট পুরে খাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, কারণ দেড় দিন ধরে স্কুলের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পদগুলো তৈরি করেছে সোমা! আর সুযোগ বুঝে একবারটি শুনিয়েও রেখেছে, কাকু, ল্যাম্ব রোস্টটা কিন্তু তোমার জন্য স্পেশ্যালি মেড। আই মাস্ট হ্যাভ ইয়োর ওপিনিয়ন।

আর আমি এখন সেই পার্টির মাঝখানে।

নির্মলদা লণ্ডনের এক পাবলিক স্কুলের শিক্ষক বলে ওঁর অভ্যাগতদের অধিকাংশই শিক্ষক-শিক্ষিকা। যাঁদের অধিকাংশই আবার সাহেব-মেম। শিক্ষক বললেই আমাদের দেশে কিছু ভারিক্কি চেহারার বয়স্ক লোকের চেহারা মনে পড়ে। নির্মলদার সহকর্মীরা দেখলাম দারুণ হাসিখুশি, টগবগে তরুণ-তরুণী। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসি নির্মলদাকে যাঁরা 'পাপা, 'ওল্ডম্যান', 'গ্র্যাণ্ডপা' বলে ডাকছেন, ঠাট্টা করেই। কিন্তু নির্মলদার কাছে ডাকগুলো ভীষণ অমায়িক ঠেকছে। নির্মলদার স্বভাবগম্ভীর আচার-ব্যবহারও দেখি বিলকুল বদলে গেছে ওঁদের সঙ্গে পড়ে। উনি ওঁদের কাছে আমাকে পরিচয় করালেন ভাইয়ের বন্ধু বলে নয়, 'জাস্ট অ্যাবাউট মাই ইয়ঙ্গার ব্রাদার হিসেবে। বলতে বলতে হাতে ধরিয়ে দিলেন বিয়ারের একটা জাগ। তারপর নিয়ে এলেন ওঁর বাঙালি বন্ধুদের কাছে। চার-চারটি বিভিন্ন বয়সি বাঙালি দম্পতি। চতুর্থ দম্পতি বয়সে সবচেয়ে ছোটো, নির্মলদা জানালেন স্বামীটি ম্যাকেলসফিল্ড হসপিটালের সার্জেন। স্ত্রী পার্ট টাইম কাজ করে পোস্ট অফিসে। নাম বৃন্দা। আর...

আর কিছুই আমার মগজে ঢুকছে না। আমি ক্ষণিকের জন্য অসম্ভব অবাক হয়ে তাকালাম মেয়েটির দিকে। রূপে জ্বলে যাচ্ছে সারা দেহ। যেমন রূপ শুধু ছবিতেই দেখি আমরা। আর দেখলেই মনে হয়, আহা, কত চেনা মুখ! কী যেন নাম? আসলে চেনা নয় কোনোখানেই, তবু মনে হয়। আর সব মনে হওয়াটাই বিদ্যুতের এক ঝলকের মতো। কিন্তু তারই মধ্যেই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে মনটা। আগে কোনোদিন না দেখার অনুশোচনায়, পরেও হয়তো দেখা না হওয়ার সম্ভাবনায়।

নির্মলদা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে কীসব বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি না। শুধু হাসি হাসি মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে দেখছি বৃন্দাকে। আর দেখছি বৃন্দাও আমাকে দেখছে! আর হঠাৎ কীরকম লজ্জা হল আমার। আমি বিয়ারের ঢোক গিলতে গিলতে সরে এলাম পার্টির অন্যত্র।

একটি ইংরেজ যুবতী সবার নজর কেড়ে নিয়েছে। সে তার স্কুলের ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক ইত্যাদির শিক্ষকদের গলা আর হাবভাব অনুকরণ করে দেখাচ্ছে। সেইসব শিক্ষকদের প্রশ্নের জবাবে বালক-বালিকারা যেভাবে কোঁকায় সেই স্বরও 'উই উঁই, কুঁই কুঁই করে শোনাচ্ছে। ওর আশপাশের সবাই হেসে কুটোপুটি যাচ্ছে, তাদের দেখাদেখি আমিও খুব হাসছি। আমার খুব ভালো লাগছে এই ভেবে যে, কলকাতার পার্টিগুলোতে যেরকম আজেবাজে কথা হয়, অনুপস্থিত লোকের নিন্দে হয় আর একটা-দুটো লোক বেরোয় যারা জীবনের সমস্ত কান্নাকাটি লোকজনের সামনে সেরে ফেলবে বলে তৈরি হয়ে আছে তেমন কিছুর সম্ভাবনা এখানে নেই। ভালো লাগছে এটা দেখেও যে কেউ কাউকে জোর করে বেশি বিয়ার, হুইস্কি, ওয়াইন গিলিয়ে দিচ্ছে না। আর ভীষণ ভালো লাগছে শুনতে কিছু বিশুদ্ধ অক্সফোর্ড-ইংরেজি অ্যাকসেন্টি। ক্রমে এইসব বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ভালোলাগাগুলোকেও ভালো লাগতে শুরু করেছে আমার। আমার মতো লোকের ভেতরে যে ধরনের বিলাত-বিলাসিতা লুকিয়ে থাকে সেটাই যেন দামি মদের মতো আস্তে আস্তে অধিকার করছে আমাকে। বৃন্দার মুখটা ভুলতে যতটা কষ্ট হবে ভেবেছিলাম তেমন কষ্ট কিছুই হচ্ছে না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বিয়ার হাতে আমি নিজেকেই ভুলতে বসেছি।

আপনাদের দেশে তো খুব ময়ূর হয়। আপনি স্বপ্নে কখনো ময়ুর দেখেছেন?— আমি চমকে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখলাম প্রশ্নটা করেছে বারবারা নামের মেয়েটি। কিছুক্ষণ আগে নির্মলদা যার সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন,

জানো তো, বারবারা ড্রইং টিচার হলে কী হবে, ওর আসল প্যাশন কিন্তু সাইকোলজি। মনোবিজ্ঞানের ওপর একটা থিসিস নিয়েও ও কাজ করছে।

আমি বারবারার কথায় কীরকম বোকার মতো হয়ে গেলাম। ময়ূর! ময়ূর দেখিনি যে তা নয়। তবে স্বপ্নে? আমি এক ঢোঁকে জাগের বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে দিয়ে একটু বা আমতা আমতা করে বললাম, ময়ূর খুব সুন্দর ঠিকই, কিন্তু আমার প্রিয় পাখি কিছু নয়। ছেলেবেলায় দেখেছি কি না মনে নেই, এখন অন্তত স্বপ্নে ময়ূর, বক বা হাঁস-টাস দেখি না।

—তুমি কি স্বপ্নে কোকিলের ডাক শুনেছ?

–কোকিল তো এখানকার খুব ডাকসাইটে পাখি।

বারবারা হা হা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

হাসতে লাগলাম আমিও। আর কোত্থেকে উঠে এসে নির্মলদা মেয়েটিকে বললেন, রাজু কিছু বাজে কথা বলে ফেলল বুঝি? বারবারা বলল, হ্যাঁ! ও বলতে চায় ও স্বপ্নে পাখি দেখে না। আমার ধারণা ও সাপ দেখে। কথাটা বলেই খুব গম্ভীর করে ফেলল মুখটা। যেন শেষের কথাটা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই বলেছে। যা দেখে ভেতরে ভেতরে হোঁচট খেলাম আমি। কারণ আমি তো সত্যিই বিরাট বিরাট সবুজ সবুজ ময়াল সাপ দেখি স্বপ্নে। কী যে তার মানে তা কেবল ফ্রয়েড সাহেবই জানেন। নির্মলদা বারবারার কথার সংশোধন করে বললেন, দুর! রাজু কেবল বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখে। ও সাপখোপ দেখবে কেন? ও কুমির দেখে।

আমরা ফের জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। আর তখনই বসার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেতাদুরস্ত উচ্চারণ আর মধুঝরা সুরে সোমা ঘোষণা করল, ডিনার ইজ সার্ভড। শ্যাল উই মুভ টু দ্য ডাইনিং প্লেস? নির্মলদার স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস শার্লি পাইন্টার ছুটে গিয়ে সোমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ও! হোয়াট আ ফাইন পিস অব ইনফর্মেশন। সাউণ্ডস লাইক মিউজিক!

আমি এইমাত্র প্লেটে উঠিয়ে নিলাম আরেক পিস ল্যাম্ব রোস্ট। উঃ কী ভীষণ ভালো বেঁধেছে পদটা সোমা। মেয়েটা সত্যিই একটা জিনিয়াস। তেরো-চোদ্দো বছরের একরত্তি মেয়ের মধ্যে অবলীলায় মিশে আছে একটা মা, একটা মেয়ে, একটা বোন। যেমন বাবাকে তেমনি এই উড়ে এসে জুড়ে বসা কাকুটিকে খাইয়ে-পরিয়ে যত্ন-আত্তিতে জিইয়ে রেখেছে। এ ক-দিনের মধ্যেই ওর বাবার দশা আমারও। সোমা না থাকলে চোখে অন্ধকার দেখি। শুনেছি ক-দিন বাদে স্কুলের এক্সকার্সনে স্কটল্যাণ্ডে যাবে। তখন যে কী হাল হবে আমাদের এক ভগাই জানে। আমি ল্যাম্বের দ্বিতীয় টুকরোটা ছুরি-কাঁটায় ছিড়তে ছিড়তে ইতিউতি তাকালাম সোমাকে ডাকব বলে। সাঙ্ঘাতিক একটা প্রশংসা ওর প্রাপ্য। কিন্তু কোথায় সোমা? লোকের ভিড়ে মিউনাইট ব্লু গাউন পরা মেয়েটিকে তো কোথাও দেখছি না। নিশ্চয়ই ডেসার্ট প্লেটগুলো রেডি করতে গেছে। মেয়েটার মাথার মধ্যে একটা রোলেক্স কি ওমেগা ঘড়ি গাঁথা আছে নিশ্চয়ই। আমি একটা ল্যাম্বের টুকরো পুরলাম মুখে।

লণ্ডনের বাঙালি ও ইংরেজ পরিবারে দুটো-একটা ডিনারে আমন্ত্রণ পেয়েছি এর মধ্যে। দেখেছি খাওয়ার শেষে অতিথিরা নিজের নিজের প্লেটগুলো সিঙ্কে নিয়ে ধুয়ে দেন। দেশের মতো এখানে তো আর কাজের লোক রাখার বিলাসিতা বিশেষ নেই। দিনে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কাজের লোক রাখলে যে দক্ষিণা গুনতে হবে তাতে মনিবের কামাই ফুরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়।

ফলে এসব ক্ষেত্রে সবখানেই দেখি আপনা হাত জগন্নাথ। এ বাড়িতে আমার আবির্ভাবের প্রথম দিনেই নির্মলদা যে দু-চারটে ব্যবহারিক শিক্ষা আমায় দিয়েছিলেন তার একটা হল গরম আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, প্লেটে গ্লাসে ওয়াশিং পাউডার ঢেলে নিজের বাসন ধুয়ে, ন্যাকড়ায় মুছে জায়গা মতো গুছিয়ে রাখা। অনেক দিন বাসন ধুতে ধুতে সিঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করেছি নির্মলদা কি সোমার সঙ্গে। নির্মলদা বলেন, সিঙ্কের পাশের এই জায়গাটা আমাদের উঠোন। এখানে দাঁড়ালে পরনিন্দা-পরচর্চা আপনা-আপনি আসে। আর আস্তে আস্তে এও দেখেছি যে, এ জায়গাটায় একলা দাঁড়িয়ে বাসন মাজার সময় আমার মনে পড়ে দেশের কথা। মায়ের কথা। মা কোনোদিন অন্যকে দিয়ে নিজের বাসন ধোয়ায় না।

ক্রমে ক্রমে সবাই নিজের নিজের বাসন ধুয়ে, জায়গা মতো রেখে আইসক্রিম কেকের প্লেট নিয়ে ড্রইং রুমে চলে গেছে। পার্টিতে শেষ ঢুকেছিলাম আমি, ডিনারও সবার শেষে হাসিল করলাম আমি। তাই কিছুটা লজ্জার সঙ্গেই গুটিগুটি হাতের প্লেট আর কাঁটা-চামচ নিয়ে চলে এসেছি রান্নাঘরের এক প্রান্তে বসানো ডিশ ধোয়ার সিঙ্কে। লজ্জা আরেকটা কারণেও; এখনও কাঁটা-চামচে পরিপাটি করে খাওয়া রপ্ত করতে পারলাম না। চিকেনের পদটা প্রায় অনাস্বাদিতই থেকে গেল আমার হাতুড়ে মার্কা খাওয়ার পদ্ধতিতে। কাঁটা-চামচের খটখটাং আওয়াজ বার করি না ঠিকই, কিন্তু সামান্য কুটকুট আওয়াজেও আহার সারতে পারি। কাঁটা-চামচ ধরলেই স্যুট-বুটের ভেতর থেকে আমার ভেতো বাঙালি সত্তাটা এখনও উঁকিঝুঁকি দেয়। প্লেটে খাবারের অবশিষ্টাংশের স্তূপ দেখে জিভ কাটতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে... আমার চিঠির উত্তর পাইনি কিন্তু।

সুরেলা, মেয়েলি কণ্ঠে কে বলল একথা? চকিতে ঘুরে দেখি কিচেনের দরজায় একটা অভিমানী হাসি মেখে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দা। চিঠি! কীসের চিঠি! কার

চিঠি! কেন! আকাশ পাতাল ভেবেও কিনারা করতে পারছি না। আমতা আমতা করে বললাম, আমায় বললেন, বৃন্দা।

বৃন্দা এক রতি অভিমানও ত্যাগ না করেই বলল, আবার কাকে?

—কিন্তু.কিন্তু...আমি তো...

–বারো বছর হয়ে গেছে তো! তাই মনে পড়ছে না। বৃন্দা এবার ঠাট্টার হাসি হাসছে। আর আমি মনে করার চেষ্টা করছি বারো বছর আগে কোনো মেয়ের চিঠি...

বৃন্দা ফের বলল, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা গান শোনার অনুরোধ করেছিলাম। আপনি খুব মানবেন্দ্র-ভক্ত ছিলেন, না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো! তাই তো! তাই তো! আমি ভুলিনি। আমার সব মনে আছে... আমার সব মনে থাকে... চিঠির ভাষা থেকে হাতের লেখা থেকে প্রেমিকার মুখ থেকে গানের বাণী থেকে গানের সুর থেকে চোখের জল থেকে... আবার কী করে, কী করে যেন সব ভুলেও যাই। যেমন ভুলেছিলাম বৃন্দাকে।

পাড়ার ডাকসাইটে কার্ডিওলজিস্টের কিশোরী কন্যা বৃন্দা। পটে আঁকা ছবি থেকে নামানো শরীর পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়, কিন্তু কী রূপ! আমি বোর্ডিং স্কুল থেকে ছুটিতে বাড়ি ফিরেছি হায়ার সেকেণ্ডারি টেস্টের পড়া করব বলে। চাইলেও বোর্ডিংয়েই থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু বেশি বেশি পড়া করতে গেলে আমার বাড়ির ছাদের চিলেকোঠাটা খুব দরকার। দারুণ নিরিবিলি। আড় চোখে আকাশ আর ঘুড়ি দেখি। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে ছাদ ঘুরে ঘুরে পায়রাদের দানা খাওয়াই। কাদের পায়রা এরা জানি না। কিন্তু দানা ধরলে হাতে এসে বসে। আমি তখন দার্শনিকের মতো ইণ্ডাক্টিভ লজিকের

সিলোজিজম কষি মনে মনে। সব প্রাণীই মরণশীল; সব মানুষই প্রাণী; কাজেই সব মানুষই মরণশীল।

পড়তে পড়তে সন্ধ্যে নামলে আমার আর একটা বিনোদন আছে। চিলেকোঠার পিছনের জানালাটা খুলে দিয়ে স্থির হয়ে বসা মেছো বাড়ির পিছনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে লোরেনদের বসার ঘর পরিষ্কার দেখি তখন। ঘরে গ্রাম চালিয়ে আপন মনে স্টেপিং প্র্যাক্টিস করছে লোরেন, কখনো কখনো স্ট্রিপ টিজ অভ্যেস করছে। পুরো মাত্রায়! তখন আমি আমার ঘরের লাইট নিবিয়ে ও তুলোর মতো সাদা আর লাস্যে ভরা দেহটাকে চোখ ভরে দেখি। অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয় শরীরে, যা আমার ভালো লাগে। মিশনের ছাত্র আমি, এই বুঝি স্খলন— ভাবি আমি। পরক্ষণেই ভাবি এও তো জীবন। লোরেন যেমন এসব করে আমাকে বিব্রত করতে, আমি দেখি কারণ আমার বিব্রত হওয়ার চেয়ে ভালো লাগাটা বেশি। আমি নারী দেহ দেখছি। বিশেষ কাউকে দেখছি না। ওই দৃশ্য আর আমার ভাবনায় শরীর গরম হয়, ঘামি। কিন্তু আমি নিজেকে বলি—এ আমার পরীক্ষা। আমি পাস করবই। তারপর একসময় আমি ঘরের জানলা বন্ধ করে, লাইট জ্বালিয়ে লজিকের বই নিয়ে বসি।

কিন্তু সেদিন একতলায় পড়ছিলাম স্বর্গত পিতার বন্ধ সেরেস্তায়। সামনে খোলা সংস্কৃত বই। যখন ঘরে ঢুকে কাজের লোক বুড়িমা একটা ছোট্ট খাম দিল হাতে। বলল, ডাক্তারবাবুর মেয়ে বিন্দি দিয়েছে। বলেচে দাদাবাবুর কাচ থেকে উত্তর এনো।

আমি বুঝলাম না কে বিন্দি, কেন চিঠি লিখেছে, কী উত্তর চায়। আমি চিঠিটা নিয়ে বুড়িমাকে বললাম, ঠিক আছে। তুমি যাও। তারপর রাইটার্সের কেরানির উন্নাসিক ঔদ্ধত্যে পড়পড় করে খাম ছিঁড়ে বার করে ফেললাম চিঠিটা। আর পড়তে গিয়ে...না, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওই কিশোরী বৃন্দা

আমাকে এই চিঠি লিখেছে। এমন এক চিঠি যার কোনো উত্তর হয় না। অন্তত আমি জানি না। কিংবা, জানলেও নিজের মাথা খুইয়ে লিখতে বসতে পারব না। বস্তুত, পড়তে পড়তেই আমি যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছি। ও লিখছে—

প্রিয়

শেষে চিঠি লিখিয়েই ছাড়লে। ছাদ থেকে কেন তাকিয়ে থাকো না আমাদের ছাদের দিকে? যাতে আমায় দেখতে পাও বা আমি তোমায় দেখতে পাই। খুব পা-ভারী লোক তুমি কিন্তু। সবাই তোমার খুব সুখ্যাতি করে। বলে তুমি খুব পন্ডিত। খুব ভালো ইংরেজি জানো। আমিও সুখ্যাতি করি। বলি, ও কোনো মেয়ের দিকে তাকায় না। খুব ভালো লাগত যদি বলতে পারতাম, শুধু আমার দিকে ছাড়া।

শুনেছি তুমি খুব গান শোনো, গান ভালোবাসো। আমিও ভালোবাসি। আমার বান্ধবীরা কেউ গান জানে না, আমি ছাড়া। কিন্তু আমি কখনো বাইরের লোকের সামনে গাই না। তুমি যদি এ চিঠির উত্তর দাও তাহলে আমি কোনো একদিন তোমায় একটা গান শোনাতে পারি। আসলে তোমার সঙ্গে খুব ভাব করতে ইচ্ছে করছে। তোমায় রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে খুব ভালো লাগে। ইচ্ছে হয় ডাকি, তারপর বুক ধড়ফড় করতে থাকে। জানি না তো তুমি কীরকম মানুষ। নিশ্চয়ই খুব গম্ভীর। কিন্তু রাগী নও। আমি সেধে আলাপ করলে হয়তো পাত্তাই দেবে না। সেদিন যখন চঞ্চলার মুখে শুনলাম তুমি সপ্তাহ খানেক পর বোর্ডিং-এ ফিরে যাবে তখন বাধ্য হয়ে চিঠি লিখে ফেললাম।

কে যেন বলছিল যে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যয়ের ‘আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি’ গানটা তোমার সবচেয়ে প্রিয় বাংলা আধুনিক। শোনা অবধি কীরকম যে করছে বুকের ভেতরটা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। এই

গানটা জীবনে সবচেয়ে ভালো লেগেছে। শুনলে কীরকম যে হয়! আর ওই গানটাই তোমার এত প্রিয় জেনে আর থাকতে পারলাম না। রোজ দু-বার করে গ্রামোফোনে শুনছি আর ভাবছি, ইশ! থাকত যদি ও এখানটায়! খুব বেহায়া ভাবছ নিশ্চয়ই আমাকে। যা আমি মোটেই নই। ছেলেদের ভালোবেসে ফেলা যে কী তা কোনোদিন জানতাম না। আর নতুন করে জানতেও চাই না। একবারই ঘাট হয়েছে আমার।

যদি চিঠির উত্তর দাও তোমাদের বুড়িমার হাতে পাঠিও। আর যদি না দাও আমি...না, আমি তোমাকে কিছু বলব না।

ইতি
তোমার বৃন্দা

মূর্খ, পাষন্ড আমি। আমি চিঠিটা পড়লাম। একবার দু-বার তিনবার চারবার পাঁচবার বহুবার পড়লাম। বহুবার কলম তুলেও রেখে দিলাম। এ আমি কী করতে যাচ্ছি! সামনে পরীক্ষা আর আমি প্রেমপত্র লিখতে বসব! তাও এমন কাউকে যে না-চিনে, না-জেনে এরকম চিঠি লিখে ফেলে! যে এত খোঁজ নিয়েছে আমার শুধু প্রেম করবে বলে। পাড়ায় টিটি পড়ে যাবে না? লোকে কী বলবে? বলবে, ওপরে সাধু সাধু, পন্ডিত পন্ডিত। তলে তলে... না, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আমার সব প্রেম চাপা থাক সত্তার গভীরে, আর ওপরে আমি আমার মতোই। এ চিঠির উত্তর দেওয়া মানেই প্রেমে পড়া। যা আমি কিছুতেই পড়ব না।

আমি চিঠিটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দুদ্দাড় করে উঠে গেলাম চিলেকোঠার ঘরে। গিয়ে জানালা খুলে বসলাম। আর দেখি স্ট্রিপ টিজে মত্ত আছে লোরেন। মনে মনে বললাম, বাঁচিয়েছে! দূর থেকে এ অনেক

ভালো। আমি কারও কাছে কিছুতেই যাব না। ভাবতে ভাবতে দু-চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল পড়ল। লোরেনের ঘরের গ্রাম থেকে এলভিসের রক-এন-রোল গান ভেসে আসছে। কিন্তু আমি শুনছি মনের ভেতরে মানবেন্দ্র গাইছে 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি।

ক-দিন বাদে চলে গেলাম বোর্ডিং-এ। চিঠি না লিখে। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে এসেও কাউকে চিঠি লিখলাম না। কলেজে যাবার পথেও তাকালাম না একটা বিশেষ বাড়ির দিকে। বুঝলাম আমি ঘোরতরভাবে প্রেমে পড়েছি এমন একটা মেয়ের সঙ্গে যে এমন একটা গান ভালোবাসে, শুনলে আমার খুব অভিমান আর অহংকার হয়। রোজ ভাবি, আর একটা চিঠি যদি আসে... যা আসে না। রাগে আমি আরও একা হয়ে যাই। নিজেকে বোঝাই যে, আমার প্রেমকে নিজে হেঁটে আসতে হবে আমার কাছে। আমি কোথাও যাই না। আমার বুকে এত প্রেম আছে যে, আমার পক্ষে কাউকে প্রেম নিবেদন সাজে না। আমি অপেক্ষা করতে করতে ভুলে যাই কীসের অপেক্ষায় ছিলাম। আমি নিজের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাই।

যখন ঘোর কাটল দেখি খুব বিব্রত, আরক্ত মুখে বৃন্দা তখনও আমার উত্তরের অপেক্ষায়। বললাম, কেন তুমি আর একটা চিঠি লিখলে না, বৃন্দা? প্রথম চিঠিতে অনেকেই তো ভুল করে। শুধু আর একটা চিঠি যদি...

বৃন্দা মাথা নীচু করে দাঁড়াল একটু। কী ভাবল। তারপর মাথা তুলে ভীষণ দুর্বল, কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, তাতে কী লিখতাম?

-শুধু একটা গানের লাইন।

বৃন্দা অপ্রস্তুত হয়ে ছুটে চলে গেল। আর ততক্ষণে ওর বিব্রত অবস্থাটা চালান এল আমার মধ্যে। হাতের ডিনার প্লেটটা মুছতে গিয়ে ছিটকে ফেললাম মাটিতে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনটে ভাঙা টুকরো কুড়োতে যাচ্ছি যখন একটা দমকা হওয়ার মতো ঘরে ঢুকল সোমা—এ কী! কী করছ কাকু! লিভ ইট! লিভ ইট! আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

ব্যাজার মুখে বললাম, দেখো তো, কী একটা নিউসেন্স ঘটিয়ে বসলাম।

সোমা প্রতিবাদ করল, না, না, দিস ইজ গুড ফর আ পার্টি।

পার্টিতে কিছু একটা না ভাঙলে পার্টি কমপ্লিট হয় না।

আমি বললাম, সব ভাঙার দায়িত্ব শুধু কি আমারই, সোমা?

ভাঙা টুকরোগুলো বিন-এ চালতে চালতে পেঁপো মেয়ের মতো সোমা বলল, যারা মন। ভাঙে তাদের এটা অভ্যেস হয়ে যায়।

সর্বনাশ! মেয়েটা কখন কী শুনল? এত অনুমান শক্তি ওর কোত্থেকে এল? ও কি তলে তলে এত পাকা নাকি? আমি ভালো করে চোদ্দো বছরের মেয়েটার দিকে তাকালাম। খুব সুন্দর, মড চেহারা। কোথাও কোনো মিল নেই সেই হারানো কিশোরী বৃন্দার সঙ্গে। আবার কোথায় যেন ওরা একেবারে এক।

সোমা ফের বলল, কাকু, তুমি ড্রইং রুমে যাও। ওখানে বৃন্দা আন্টির হাজব্যাণ্ড তোমার জন্য ওয়েট করছে।

আমি তরুণ সুদর্শন ডাক্তারটির সঙ্গে দ্বিতীয় বারের আলাপেও কেন জানি না করমর্দন শুরু করে দিলাম। আমাদের দুজনের পেটেই বেশ কিছু লাগার

বিয়ার পড়েছে। আমার বেশ ভালো লাগল সুমিতকে। সুমিত বলল, তা হলে একটা দিন ঠিক করুন। কবে আসবেন। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

বললাম, ঠিক এখনই পারছি না। যদি ক-দিন বাদে একটু ফোন করেন নির্মলদার এখানে।

সুমিত বলল, নো প্রবলেম! আমি ফোন করব।

কিন্তু তারপরেও একটু প্রবলেম থাকছে। আমি যাব, যদি বৃন্দা গান শোনান।

আকাশ থেকে পড়ল যেন সুমিত। একটু থমকেই রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কী করে জানলেন যে ও গান জানে? নিশ্চয়ই নির্মলদা বলেছেন?

একটু চাপা গর্ব নিয়েই বললাম, আমি সেন্ট্রাল ক্যালকাটার ছেলে। আমরা লোকের মুখ দেখেই টের পাই কে, কী জানে বা জানে না। বৃন্দা বলল, না, আপনি একটু ভুলও করলেন মিস্টার মুখার্জি। সেন্ট্রাল ক্যালকাটার লোকেরা গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও অনেক সময় আসেন না।

আমি প্রতিবাদ করে বলতে গেলাম,, না, আমি তা নই। কিন্তু কথাটা আটকে রইল জিভ আর গলার মাঝখানে কোথাও।

সুমিত হঠাৎ আমার সাহায্যে এল। বলল, মিস্টার মুখার্জিকে কিন্তু ডেট ফেল করার লোক বলে মনে হচ্ছে না। তারপর আমার হাতে ফের হাত রেখে বলল, না, না, আপনি প্লিজ আসুন।

আই উইল ফোন ইউ।

আমি বললাম, বহুদিন ভালো বাংলা আধুনিক শুনিনি। বৃন্দা কি কিছু পুরোনো আধুনিক জানেন? ঘাড় নেড়ে বৃন্দা বলল, এক কালে কিছু জানতাম। এখন রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কিছু গাই না।

বুকে একটা চিনচিনে ভাব হচ্ছে হঠাৎ। একটা ভয়ও। হয়তো এই গানের নিমন্ত্রণও রক্ষা করা হবে না। সেন্ট্রাল ক্যালকাটার ছেলেদের দুর্নাম থেকেই গেল।

আমি হয়তো জীবনে শেষবারের মতো বৃন্দাকে দু-চোখ ভরে দেখছি। আর সোমা কখন এসে হাতে ধরিয়ে দিল ডেসার্টের প্লেট।